দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...7 AUG 2017...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...১...

# সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় বাধা কোথায়?

এস এম রওনক রহমান আনন্দ

সরকার যদি একযোগে মাসব্যাপী প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন মাত্র দুই লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা একযোগে নিতে পারবে না? এ ক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফরম পূরণ করার সময় ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও পছন্দের বিষয়ের তালিকা দিতে পারে। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থাকলে শিক্ষার্থীদের খরচ ও ভোগান্তি কমত, অনিশ্চয়তা দূর হতো

প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশের পর মেডিক্যাল/ প্রকৌশল/ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিগত বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, প্রশ্ন উঠেছে বিদ্যমান ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে! মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলকে ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে না পারার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও কিছুটা দায়ী করেছেন।

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়ায় মেডিক্যাল/প্রকৌশল/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় লক্ষাধিক আসনের বিপরীতে প্রতি বছর একজন শিক্ষার্থী কমপক্ষে দশটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জনও করে থাকে। দেশের সব মহলে এখন একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—এমন কোনো ভর্তি প্রক্রিয়া কি অনুসন্ধান করে বের করা যায় না— যাতে করে সমন্বিতভাবে অনুষদভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়?

পৃথিবীর উন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার জন্য সরকার কর্তৃক আলাদা কর্তৃপক্ষ রয়েছে। সংশ্লিষ্টসকল কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে আমাদের দেশেও এ ধরনের একটি কর্তৃপক্ষ/পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবারও গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে না। সরকারের প্রস্তুতি না থাকায় ও সমন্বয়হীনতার কারণে আগের মতোই ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। সমন্বিত বা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে ২০০৮ সালে যে আলোচনা শুরু হয় তার ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের ৭ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উপাচার্যদের সভায় বেশিরভাগ উপাচার্য, সমন্বিত বা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছিলেন। এরপর এ নিয়ে আরও কয়েক দফা আলোচনাও হয়। কিন্তু ওই শিক্ষাবর্ষে পুরাতন নিয়মেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি পরীক্ষায় মাত্র দুজন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রচলিত ভর্তি প্রক্রিয়াকে ত্রুটিপূর্ণ মন্তব্য করে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই গুচ্ছ পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলছেন, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের মতো করে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট নিজেদের স্বতন্ত্র মান বজায় রাখতে চায়।

একই মত দিয়েছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও। এর আগে অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উদ্যোগে ২০১৪ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) মধ্যে গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে আঞ্চলিক অগ্রাধিকারের দাবিতে সিলেটের স্থানীয়দের আন্দোলনের পর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ পদ্ধতির ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দিলে সে উদ্যোগ আর আলোর মুখ দেখেনি।

চলতি বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আট লাখ এক হাজার ৭১১ জন। এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯৬৯ জন। জিপিএ ৪ থেকে ৫-এর নিচে পেয়েছে দুই লাখ ১৬ হাজার ২৮৭ জন। এ সংখ্যার সঙ্গে যোগ হবে গতবারের ভর্তীচ্ছুরাও। সব মিলিয়ে প্রায় ১২ লাখের মতো শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধে নামবে। ৩৮টি পাবলিক ও ৮৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্নাতক (পাস/সম্মান) শ্রেণিতে মোট আসন ৮ লাখ ৫৬ হাজার ৪৮৬টি। এবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৮টি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, যেগুলোতে প্রায় সাড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে। উচ্চশিক্ষার ভুবনে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এখন ভর্তি পরীক্ষায় নেমে পড়বে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভিন্ন দিন নির্ধারিত থাকে। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে পরীক্ষায় অংশ নিতে। এ ক্ষেত্রে ভর্তীচ্ছুকে পোহাতে হয় নানা দুর্ভোগ। আর উৎকণ্ঠায় থাকেন অভিভাবকরা। এমনকী একই জেলায় পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে একাধিকবার যেতে হবে শিক্ষার্থীদের।

তবে শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির শিকার হলেও পৃথক পৃথক ভর্তি পদ্ধতিতে লাভবান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করায় ফরম বিক্রি বাবদই অনেক টাকা উপার্জন করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অভিযোগ আছে; আবেদন ফরম, খাতা ও পরিদর্শন ফি বাবদ যত টাকা খরচ হয়, তার কয়েক গুণ বেশি টাকা ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষার আয়ের ৪০ শতাংশ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা রেখে তা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার কথা। তবে গুচ্ছ পদ্ধতি চালু হলে ভর্তি পরীক্ষার সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ কমে আসত। কারণ এর ফলে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র থেকে নেওয়া পরীক্ষার মাধ্যমেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত শিক্ষার্থীরা। আগে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম থাকায় পৃথক পরীক্ষা হলেও তেমন একটা সমস্যা হতো না। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। ইউজিসির একাধিক বার্ষিক প্রতিবেদনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ, ব্যয়বহুল ও কোচিং-নির্ভর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি গুচ্ছ করে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো যদি শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নিয়ে ফলাফলের ভিত্তিতে কে কোন মেডিক্যালে পড়বেন, তা ঠিক করে দিতে পারে—তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন তা পারে না? সরকার যদি একযোগে মাসব্যাপী প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন মাত্র দুই লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা একযোগে নিতে পারবে না? এ ক্ষেত্রে ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফরম পূরণ করার সময় ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও পছন্দের বিষয়ের তালিকা দিতে পারে। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থাকলে শিক্ষার্থীদের খরচ ও ভোগান্তি কমত, অনিশ্চয়তা দূর হতো। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সহজ হতো। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদরাও মত দিয়েছেন গুচ্ছ পদ্ধতির পক্ষে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ এবং শিক্ষার হার বাড়ানোসহ বেশ কিছু ইতিবাচক অর্জন রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। আমরা মনে করি, গুচ্ছ পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও সাধুবাদ পেতে পারে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের ভর্তিফরম বিক্রি থেকে পাওয়া আয়ের বিষয়টি বাদ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অসীম দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে আমরা কেবল গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব। এতে সার্বিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা উপকৃত হবে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের মধ্যবিত্ত এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের দুঃখকষ্টের বিষয়টি শিক্ষানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

লেখক শিক্ষার্থী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

স্বাক্ষর